দৈনিক জনকণ্ঠ
17
তারিখ ... AUG. 1 0 1999 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭ ...

বিজ্ঞান সাধ

পারভীন সুলতানা

১৯৫৭ সালে ফ্লোরা মজিদ যখন আইএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্মানে ভর্তি হন তখন সে ব্যাচে তিনিই একমাত্র ছাত্রী ছিলেন। সে সময় বিজ্ঞান অনুষদে অন্যান্য বিভাগে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল তথৈবচ। মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে কোন ছাত্রীই ছিল না। সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে। সর্বসাকল্যে তিন জন। তখন বিজ্ঞান অনুষদে মোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগারো। তাই নিয়ে কত হৈচৈ। বিজ্ঞান অনুষদে এত সংখ্যক ছাত্রীর উপস্থিতি এর আগে ছিল না। ছাত্রীদের আধিক্যে উৎসুক করে তুলেছিল তখনকার কিছু ছাত্র-শিক্ষককে।

এখন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে সংখ্যার দিক দিয়ে ছাত্রীরা ছাত্রদের উপহাস করেছে। অন্যান্য বিভাগেও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় আধাআধি। তবে বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রী সংযোগ বৃদ্ধিতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিদ্যার্জন করেই সকলে বৈজ্ঞানিক হয় না বা হতে পারেনা। ব্যাপারটি ছাত্রছাত্রী উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি, কর্ম প্রাপ্তির অপর্যাপ্ততা আর সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে এখন দেখা যাচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান পাস করে ব্যাংকের চাকরি নিচ্ছে অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ডিগ্রী নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে যোগ দিচ্ছে। মেয়েদের অবস্থা আরও সঙ্কীর্ণ। বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। দেখা গেছে কঠোর পরিশ্রম করে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি লাইব্রেরি ওয়ার্ক ও প্র্যাকটিকাল ওয়ার্ক করে যে ছাত্রীটি বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে পরবর্তীতে তার সময় কাটে ঘরকন্না ও সন্তান পালনে। এর কারণ যেমন রয়েছে নিজস্ব উদ্যোগের অভাব তেমনি পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা। আমাদের সমাজে অনেক তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ অনেকটা 'সোস্যাল স্ট্যাটাসের জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করলেন কিন্তু স্ত্রীটির বিদ্যা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাঁরা অশিক্ষিত লোকদের মতোই আচরণ করে। পদার্থ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী স্ত্রীকে এ দেশের স্বামীরাই একমাত্র বলতে পারে "আমার সংসার দেখাই তোমার একমাত্র কর্ম"। নিজ জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে না লাগাতে দিয়ে স্বামী প্রবরটি শুধু স্ত্রীর ওপর অন্যায় করেনি। দেশ ও জাতির প্রতিও অন্যায় করেছে। তার স্ত্রীটির বিদ্যার্জনের জন্য রাষ্ট্রকে যে খরচ করতে হয়েছে কাজের মাধ্যমে তা ফিরিয়ে দেয়ার যে সুযোগ ছিল তা ব্যবহার করতে না দিয়ে স্বামীটি নিশ্চয় অপরাধ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা সকলে কেমন জানি নির্লিপ্ত। তাই অনেকের মতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের আগে ছেলেমেয়ে সকলের তার শিক্ষাকে কাজে লাগাবে এই মর্মে বন্ড সাইন করা উচিত।

যাইহোক। এ যুগে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই শতাব্দী মহাকাশ বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞানে ও ক্লোনিং আবিষ্কারের মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে চমকপ্রদ উদ্ভাবন হচ্ছে তাতে এই প্রমাণিত হয় যে বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার হারে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অবস্থান শতকরা এক ভাগ। জাপানসহ উন্নত কিছু দেশে এই হার আরও বেশি। এক জরিপে দেখা গেছে আমাদের দেশে ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের সংখ্যা ছিল ২৩,৫০০। ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখের মতো। এর মধ্যে মহিলা বিজ্ঞানীদের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও বাংলাদেশ মহিলা বিজ্ঞানী সমিতির সদস্য সংখ্যা ধরলে এর সংখ্যা ৩৪০ জন। অবশ্য সমিতির কর্মকর্তারা মনে করেন এর চেয়ে আরও ঢের বেশি মহিলা বিজ্ঞানী দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা অনেক কম। বিদেশে মহিলা বিজ্ঞানী সংখ্যাই বেশি নয় তাদের গবেষণালব্ধ কাজও ঈর্ষণীয় বটে। বায়ো টেকনোলজি ও মহাকাশ বিজ্ঞানে তাদের অবস্থা চমকপদ। কিছুদিন আগে মহাকাশ যান কলাম্বিয়ায় প্রথম মহিলা কমান্ডার নিযুক্ত হন এলিন কলিন্স।

শুধু বর্তমান নয় অতীতেও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারীদের সুস্পষ্ট অবস্থানে বর্তমানের অনেক বিজ্ঞানীকে হতবাক করে দেয়। আগুন আবিষ্কারকে অনেকে সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ও প্রধান আবিষ্কার মনে করে। অনুমান করা হয় আগুনের আবিষ্কারক নারী। যদি তাও না হয় নারীরাই আগুন ও তাপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাদ্য সংরক্ষণ করতে শিখেছে। সমাজকে মৃৎপাত্র তৈরির রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুতা কাটার পদার্থ বিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি এবং শন ও তুলার উদ্ভিদ বিদ্যার জ্ঞান দান করার কৃতিত্ব শুধুমাত্র নারীদের। নারীরাই প্রথম বিজ্ঞানী যেমন তারাই প্রথম চিকিৎসক, শিল্পী, প্রকৌশলী। নারীদের বাসস্থান শুধু রন্ধনশালা ও মেলাইকক্ষ দিয়ে সাজানো ছিল না। নিজ বাসগৃহে তারা তৈরি করেছে বিজ্ঞান গবেষণাগার (নারী মুক্তির প্রশ্নে)।

সভ্যতার উষালগ্নে নারী বিজ্ঞানীদের যে উপস্থিতি তা কোন কোন সময় নিভিয়ে গেলেও বিলুপ্ত হয়নি। তার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ শতাব্দীতে এসে আমরা পেয়েছি গণিত বিদ্যা। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যার অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হাইপাশিয়া। মিসরের আলেকজেন্দ্রিয়া শহরে জ্ঞানী থিউসের কন্যা হাইপাশিয়া ইতালি ও এথেন্সে যান উচ্চশিক্ষার জন্য। সেখান থেকে ফিরে এলে তাঁর অসামান্য জ্ঞানের বহর দেখে আলেকজেন্দ্রিয়ার নগরপালরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। হাইপাশিয়া বহু বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তৃতীয় শতকে বীজগণিত আবিষ্কারক দায়োক্যান্তাস রচিত 'এ্যারিথমেটিকা' পুস্তকের ওপর ১৩ অধ্যায়ে একটি আলোচনা ও এ্যাপোলোনিয়ামের 'কৌণিক ছেদ' পুস্তকের ওপর আর্য অধ্যায়ের আলোচনা। সে সময় রোমানরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আলেকজেন্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং হাইপাশিয়াকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য জোর করে। হাইপাশিয়া এতে রাজি না হওয়ায় একদিন তারা হাইপাশিয়াকে গির্জায় নিয়ে গিয়ে ধারাল শামুক দিয়ে মাংস খুবলে তোলে। এর ফলে হাইপাশিয়ার মৃত্যু হলে তারা তার মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে।

এই শতাব্দীর আরেক বিদুষী নারী বিজ্ঞানী মেরী কুরি। জ্ঞান পিপাসু মেরী নিজ দেশ পোল্যান্ড ছেড়ে ফ্রান্সে চলে আসেন। ১৯০৩ সালে স্বামী পেরী কুরির সাথে যৌথভাবে পদার্থ বিজ্ঞান নোবেল পান। তিনি প্রথম মহিলা নোবেল বিজয়ী। স্বামীর মৃত্যুর ১৯১১ সালে তিনি এককভাবে রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দু'বার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নোবেল ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। তাঁর আবিষ্কৃত রেডিয়াম ক্যান্সার থেরাপিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বত্র। মেরী কুরির কন্যা ইরিন কুরিও একজন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী।

বাংলাদেশে নারী বিজ্ঞানী ঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Besir)-এর প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী লুৎফুন্নাহার বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে মহিলা বিজ্ঞানীদের এ দেশে যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না। এটি সমাজে সর্বত্রই দৃশ্যমান। যাঁরা অসাধারণ মেধার অধিকারী তাঁরা এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রম করতে পারেন। ১৯৬৪ সালে যখন তিনি বিসিআইএসআরে যোগ দেন তখন সেখানে মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল ৯/১০ জন। বর্তমানে এ সংখ্যা আনুমানিক ৬০ জনের মতো। তিনি স্বীকার করেন সংখ্যা আরও বাড়া উচিত ছিল, বাড়েনি। এই প্রতিষ্ঠানে ছাড়াও বর্তমানে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মহিলারা বিভিন্ন বিজ্ঞানী গবেষণায় রত বলে তিনি জানান। বিজ্ঞানে মহিলাদের কম উপস্থিতির ব্যাপারে লুৎফুন্নাহার মনে করেন, বিজ্ঞান বিষয়টি এমন প্রতিযোগিতামূলক যে সেখানে মেয়েদের টিকে থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে অনেক সময়। শুধু বিজ্ঞান অধ্যায়নের ব্যাপারে বর্তমান এমবিএ প্রজন্মর অনিহার ব্যাপারে লুৎফুন্নাহার বলেন, এখন কম্পিউটার শিক্ষায় ভাল চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আসলে চাকরিমনা জাতি। গবেষণায় নিজেদের নিবিষ্ট করার চেয়ে চাকরিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। তবে মেয়েরা যখন গবেষণায় নিযুক্ত হন তাঁরা তখন মনপ্রাণ দিয়ে করেন বলে মনে করেন লুৎফুন্নাহার। কিন্তু এর মূল্যায়ন হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদিন যেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন চাকরির বিধিমালা অনুযায়ী এক একজনের ১৫/১৬ বছর চাকরি জীবনে পদোন্নতি পেয়েছেন দুই একবার। এছাড়াও তিনি টাকা-পয়সার ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, দেখা গেল একটি প্রকল্প নিলাম। টাকা-পয়সার অভাবে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং বিজ্ঞান চর্চায় এই মন্থরতায় শুধু বৈজ্ঞানিকদের দোষ দেয়া যায় না।

বর্তমানে বিজ্ঞান চর্চায় নারীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন

সত্যিকারভাবে আমাদের বিজ্ঞান চর্চায় কোন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই। উল্লেখ্য, শুধু উন্নত নয় উন্নয়নশীল দেশেও চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিজ্ঞান গবেষণা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ছিলেন বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে উদার। যে কোন বিজ্ঞানী তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ পেতেন। বেসরকারীভাবেও বিভিন্ন ওষুধ বা অন্যান্য কোম্পানি মোটা বেতনে বিজ্ঞানী নিযুক্ত করে শুধু গবেষণা কাজের জন্য। আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ব্যয় হয় জিডিপির মাত্র দশমিক এক শতাংশ। বাংলাদেশে নারী বিজ্ঞানীদের সাহায্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশ মহিলা বিজ্ঞানী সমিতি। এই সমিতির বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের চেয়ারপার্সন গুলরু বেগম শফি। তিনি বলেন, সমিতি যে খুব বেশি কিছু করেছে তা আমরা বলব না। আসলে কর্মস্থলের কাজ ও বাড়ির কাজ সেরে মহিলারা সময় দিতে পারে না। একজন পুরুষ সকাল থেকে রাত অবধি বাড়ির বাইরে থাকতে পারলেও বাড়ির গৃহিণী ও সন্তানের মা মহিলারা তা পারে না। তাই দেখা যায় অবসর গ্রহণের পর মহিলা বিজ্ঞানীরা কিছু করার উদ্যোগ নিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা এই কারণে পিছিয়ে আছে। পড়াশেষে একজন তরুণী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে দেখা যায় সে সময় সে সংসার ক্ষেত্রেও প্রবেশ করছে। ফলে সংসার সামলিয়ে পেশার উন্নতি করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষ সহকর্মীরা ঠিকই রাতদিন খেটে পারদর্শিতা দেখিয়ে পদোন্নতি নিয়ে নিচ্ছে। ফলে মেয়েটি ৮/১০ বছর পিছিয়ে পড়ে। গুলরু শফি বলেন, এ কারণে জাপানের তরুণীরা বিয়ের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছে যা তাদের সামাজিক সমস্যা
দিয়েছে। গুলরু বেগম বলেন, এই বয়সেও আমি কোন স্যা
করতে ঢাকার বাইরে সহজে যেতে চাই না একমাত্র বাসে কিছু
অশোভন আচরণের জন্য। এ প্রসঙ্গে প্রাণীবিদ্যার ছাত্রী শারমিন
মাস্টার্সে আমার গবেষণার বিষয় ছিল কালাজ্বর। এ জন্য অ
বাইরে স্যাম্পল যোগাড় করার জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্য বা
মুখ চেয়ে বসে থাকতে হতো কখন তাঁরা সময় দেন কারণ এখন
দেশে একজন তরুণীর পক্ষে একা একা অচেনা যে যাওয়া
পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও নিরাপত্তার অভাব মেয়েদের বি
ব্যাহত করে বলে গুলরু বেগম মনে করেন। নিজ শিক্ষকতা
অভিজ্ঞতায় বলেন, ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে যে সন্ধ্যা
মেয়েরাই বাড়ি যাবার তাগিদ অনুভব করে। ফলে খা গেল, অ
ফেলে অথবা বিষয়টি পুরোপুরি না বুঝে তারা বাড়িমুখে যাত্রা
ক্ষেত্রে তাদের সহপাঠীরা রাত অবধি ল্যাবরেটরিতে কাজ করে পু
বুঝে ফেলল। তিনি বলেন, অথচ উচ্চশিক্ষার য আমি বিদে
সেখানে নিশ্চিন্তে মধ্য রাত অবধি কাজ করে ট্যাক্সিতে ঘরে ফি

পথিকৃৎ ঃ বাংলাদেশে মহিলা বিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ হিসাবে যার নাম
আগে আসে তিনি হলেন ডঃ মালেকা আল রাজী বিজ্ঞান চর্চায় নিবে
প্রাণ এই বিদুষী নারী শুধু অসামান্য মেধা খ্যাত নন,
অনিন্দ্যসুন্দরী হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ তাঁর তরুণ বয়
চল্লিশ দশকে একজন বাঙালী মুসলমান মেয়ে চর্চা করা যে
দুরূহ কাজ ছিল তা সহজে অনুমেয়। বয়সের ডঃ মালেকার
থেকে অনেক চেষ্টা করেও কোন তথ্য উদ্ধার সম্ভব হয়নি।
ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহযোগিতায় যতটুকু জানা সম্ভব হত বোঝা গেছে স্কু
শিক্ষক বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্রত হন। ঘরে
বাইরে সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করা সম্ভব ছিল না বলে
সকল এ্যাপারেটাস ঘরে কিনে দেয়া হয়েছিল সদরঘাটে অবস্থিত
ইডেন স্কুল থেকে মেয়েদের মধ্যে সপ্তম স্থান করে তিনি ম্যাট্রিক
পাস করেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস
করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। তিনি
একমাত্র ছাত্রী ছিলেন এ বিভাগের। ১৯৫০ সালে তিনি লন্ডন
ইউনিভার্সিটিতে রসায়ন শাস্ত্রে পিএইচডি লাভ করেন। তিনি সম্ভবত
প্রথম বাঙালী মুসলিম মহিলা যিনি পিএইচডি করেন। তাঁর

বী জীব উপযুক্ত
ড়ের ন্যায় আচরণ

প্রঃ পুর
উঃ বাঁকানো।